ভাষা আন্দোলন এবং পূর্ব-বাংলার মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য

ফোরকান আহমেদ

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookFurkan

প্রাচীনকাল থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবে পূর্ব-বাংলার সাধারণ মানুষের মনোজগতের রূপান্তর ঘটলেও সবসময় আনন্দ-বেদনার অনুভূতিগুলো তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। উৎসবের উদ্‌যাপন কিংবা শোষণমুক্তির আন্দোলন, প্রায় সকল ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে। ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল এই মেলবন্ধনের মূল ভিত্তি। ব্রিটিশ শাসনের সময়কালে অর্থনৈতিক শোষণ ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন পূর্ব-বাংলার মানুষের দীর্ঘদিনের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক একতার মূলে আঘাত করে এবং জন্ম দেয় সাম্প্রদায়িক সংকট ও শ্রেণি-দ্বন্দ্বের। দেশভাগের আগে পূর্ব-বাংলার সাধারণ মানুষ মনে করেছিল স্বাধীনতা পেলে অর্থনৈতিক মুক্তি মিলবে এবং শোষণমুক্ত একটি সমাজ বিনির্মাণ হবে। রক্তাক্ত এক অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অর্জন হলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি বরং ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে শাসকগোষ্ঠীর উপনিবেশসুলভ মনোভাব ও আচরণ। ফলে দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও শ্রেণি-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে গিয়ে সকলে একত্র হয়েছে ভাষা আন্দোলনে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব-বাংলার মানুষের স্বাধীনতা-চেতনার ভিত্তি রচনা করে এবং এটি তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে পুনর্জাগ্রত ও সুদৃঢ় করেছে।

হাজার মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হলো পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র। দেশভাগের আগে থেকেই বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে চলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক। যে ঢাকায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যে পূর্ব-বাংলার মানুষের ভোটের কারণে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয় পেয়েছিল, যে পূর্ব-বাংলার হাজারো মানুষের রক্তের উপর দিয়ে অনিবার্য হয়ে গিয়েছিল আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, সেখানে এসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দিলেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'।[১] একইসাথে যারা আন্দোলন ও সমালোচনা করছিল, তাদের কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়ে গেলেন। পূর্ব-বাংলার ছাত্র-জনতা সাথে সাথেই প্রতিবাদ করেছিল। দেশভাগ-পূর্ব কল্পিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যাশা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রাপ্তি, এ দু'য়ের পার্থক্য খুব শীঘ্রই স্পষ্ট হতে থাকে। সময় যত গড়িয়েছে, ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছে প্রায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। ফলে ভাষা আন্দোলন আর কোনো রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, যুক্ত হয়েছে এর বহুমুখী প্রেক্ষাপট। আন্দোলনকারীদের দমাতে শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র থেকে অস্ত্র কোনো কিছু বাদ রাখেনি। গোটা বিশ্ব দেখল একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত এক অধ্যায়। সমগ্র পূর্ব-বাংলায়, শহর থেকে গ্রাম, কৃষক-শ্রমিক থেকে পেশাজীবী সকলে নেমে এসেছিল রাজপথে, আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদের কাছে বন্দুকের গুলিও যেন অসহায়। এ যেন অসাম্প্রদায়িক গণমানুষের পূর্ব-বাংলার পুনর্যাত্রা শুরু। পাকিস্তান যে সম্প্রদায়গত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল, পূর্ব-বাংলায়

তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এজন্য ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ স্বীকার করে নিয়েছেন, একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা ও বাতিঘর হিসেবে কাজ করেছে।

বদরুদ্দীন উমর, আহমদ রফিক, অলি আহাদসহ অনেক গবেষক ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ গবেষণায় ভাষা আন্দোলনকে দেখানো হয়েছে ১৯৫২ সালের সমসাময়িক কালের ঘটনার প্রেক্ষাপটে, যার অধিকাংশই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আড়ালে থেকেছে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মনোবিশ্লেষণ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ অনেক মার্কসিস্ট গবেষক শ্রেণি-সচেতনতার পটভূমিতে এ আন্দোলনকে দেখার চেষ্টা করলেও সাম্প্রদায়িক সংকট থেকে অসাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্বের পুনর্জাগরণের বিষয়টি আড়ালে থেকে গেছে। এ গবেষণা-প্রবন্ধে আমি ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত সকল মানুষের দৃষ্টিতে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করব। শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কীভাবে নিজেদের মধ্যে একতা ও আন্দোলনে একাত্মতা পোষণের মনস্তত্ত্ব তৈরি হলো, তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। পাঠকের সুবিধার্থে খুব সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের ঘটনার প্রয়োজনীয় অংশের বিবরণ দেওয়া হবে। ইতিহাসের নিরিখে দেশভাগ তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের আগের সময় থেকে আর্থ-সামাজিকসহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখা হবে।

প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে গবেষণার 'গুণগত' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে সমসাময়িক জনশুমারি প্রতিবেদন, রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতাহার এবং পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকাশিত একাধিক প্রতিবেদনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সামগ্রিক অবস্থা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সহায়তা নিয়েছি। এক্ষেত্রে প্রকাশের সাল ও স্থান, তথ্য-উপাত্তের ব্যবহার, লেখকের বস্তুনিষ্ঠতা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শুধু ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক গ্রন্থে সীমাবদ্ধ না থেকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক একাধিক বিষয় সামনে রেখে গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পূর্ব-বাংলার মানুষের মনোজগতের রূপান্তর

অন্য যে-কোনো জনগোষ্ঠীর মতো পূর্ব-বাংলার মানুষের মনোজগৎও প্রাচীনকাল থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গঠিত ও পুনর্গঠিত হয়েছে। ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব এ পরিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি। মানুষের চিন্তাধারা ও অনুভূতির বিবর্তন সমাজের-উন্নয়নের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে এবং এখনও সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

পুরোনো দুনিয়ায় মানুষের মনোজগৎ মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক চর্চা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মন্দিরে পূজা এবং পৌরাণিক কাহিনি ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ (চৌধুরী, ২০০২, পৃ. ১০২-১৫৭)। সাহিত্যকর্ম মানুষকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দিত। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনকালেও মানুষের মনোজগতে ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে। ইসলাম ধর্মের আগমনের সাথে নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা তৈরি হয়। ধর্মকেন্দ্রিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি ও উৎসবের প্রচলন থাকলেও তার চর্চা হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে, যা বাঙালির উদারতা, সমন্বয়বাদিতা ও অসাম্প্রদায়িক

চরিত্রের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। লোকসংস্কৃতি, গান, কবিতা এবং লোককাহিনির বিকাশ মানুষের চিন্তাভাবনায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় এক ধরনের সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর সূচনা ঘটে, যা মানুষের চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি নিয়ে সচেতন হতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব এবং তাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও শাসকগোষ্ঠীর বিভাজনের নীতির প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্ভব ঘটলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কাজী নজরুল ইসলামের মতো অনেক লেখক মানুষের চিন্তাভাবনাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেন, যা স্বাধীনতা, মানবতা এবং নৈতিকতার ধারণাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে (আনিসুজ্জামান, ২০১২, পৃ. ৩৫-১১১)। পূর্ব-বাংলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলা যায়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এ অঞ্চলের মানুষের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। প্রতিকূল আবহাওয়া, নদী-বিধৌত ভাটি অঞ্চলে জীবিকা নির্বাহের অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে টিকে থাকার লড়াই চলেছে অবিরত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাঙালি বারবার অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে এবং শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ (১০৭৫-১০৮০) থেকে শুরু করে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন (১৭৬০-১৮০০), রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-১৭৮৭), ফরায়েজি আন্দোলন (১৮৪০-), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৭), নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬০), পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-১৮৭৩), তেভাগা আন্দোলনের (১৯৪৬) মতো অসংখ্য ঘটনা ক্রমাগত নানান প্রান্তের জনসমাজের মধ্যে ঘটেছে। এ-সকল আন্দোলন বিশ্লেষণ করলে একটি ব্যাপারে সব ঘটনার মধ্যে মিল পাওয়া যায়– অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি। অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদী এবং চিরবিদ্রোহী করে তুলতে ভূমিকা পালন করেছে (চক্রবর্তী, ২০১৪)।

ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভাষা আন্দোলনকে গবেষকগণ কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। কেউ কেউ ১৯৪৭-এর পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে দাবি-দাওয়াকে ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব বলে উল্লেখ করেছেন (রহমান, ১৯৯২, পৃ. ৭৪-৭৬)। পাকিস্তানের জন্মের আগে থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে পত্রপত্রিকা ও বুদ্ধিজীবী-মহলে আলাপ চলতে থাকে। সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকায় 'পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, ইংরেজি ভাষা যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভ ছিল, সেহেতু কোনোভাবেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরেজি গ্রহণযোগ্য না, উর্দুর পক্ষে দাবি আসলেও বাংলা ভাষার চেয়ে বেশি জোরালো না (বেগম, ৩রা আগস্ট ১৯৪৭)।

১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পাকিস্তানের ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা নিম্নরূপ:

ভাষা	জনসংখ্যা	শতকরা হার
বাংলা	৪,১২,৯১,৯৮৯	৫৪.৬
পাঞ্জাবি	২,১৪,৬৬,৮১৫	২৮.৪
উর্দু	৪৫,১৯১৩১	৭.২
সিন্ধি	৪৩,৫৯,২৮৭	৫.৮

পশতু	৩৫,৮৯,৬২৬	৭.১
ইংরেজি	১৩,৭৭,৫৬৭	১.৮
বেলুচ	১০,৭৫,৯৯৯	১.৪

তালিকা: পাকিস্তানের ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা (Choudhury, 1984, P. 129)

বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন; ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ এবং ১৯৫২ সালের জানুয়ারি-মার্চ (উমর, ১৯৭০, পৃ. ক)। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত *তমদ্দুন মজলিশ*'র পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্তকরণসহ ভাষা-বিষয়ক বিভিন্ন দাবি-দাওয়া উত্থাপন করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে তাঁর বক্তব্যে বলেন, জনসংখ্যায় পাকিস্তানের বৃহত্তম অংশ বাঙালি, সুতরাং তাদের মাতৃভাষা বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। তিনি বাংলা ভাষাকে ইসলামবিরোধী ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে 'ভারতের দালাল' হিসেবেও আখ্যা দেন। প্রতিবাদস্বরূপ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অবিলম্বে অধিবেশন ত্যাগ করে ফ্লাইটে করে ঢাকায় চলে আসেন (মৈত্র, ২০১৯, পৃ. ২০৮)। পূর্ব-বাংলার ছাত্রসমাজ তাৎক্ষণিক এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায়।

১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ব্যাপারে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালনকালে সচিবালয়-গেট থেকে গ্রেফতার হন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং অলি আহাদসহ অনেকে এবং তাদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনে এটাই ছিল প্রথম কারাবরণ (রহমান, ২০১২, পৃ. ৩৫)। ১১ মার্চের বিভিন্ন ঘটনায় আহত ও পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃতদের এক হিসাবে দেখা যায়, গুরুতর আহত ১৮, আহত ২০০, গ্রেফতার ৯০০, কারাবন্দি ৬৯ (উমর, ১৯৭০, পৃ. ৭৫)। এর প্রতিবাদে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহসহ প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমায় এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে (হোসেন, ২০০০)।

১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ২৪শে মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্রসমাজ সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া জানায়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এমন বক্তব্য ছিল চরম হতাশাব্যঞ্জক। মুক্তিযুদ্ধ গবেষক মফিদুল হকের পর্যবেক্ষণ:

> পশ্চিম অংশ গঠিত হয়েছে চার ভিন্ন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার চারটি প্রদেশ নিয়ে। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ এবং ৫৬ শতাংশ নাগরিকের বসবাস এখানে, তাদের মাতৃভাষা বাংলা। এমন বাস্তবতায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সেটা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল জরুরি। এক্ষেত্রে জিন্নাহর জীবনাচারে অনুসৃত আধুনিকতার কোনো পরিচয় আর খুঁজে পাওয়া গেল না, রাজনীতিতে তিনি হয়ে উঠলেন কেন্দ্রশাসিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন গভর্নর জেনারেল, যিনি পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোতে পাঞ্জাবি ও মোহাজের এলিট চক্রের আধিপত্যের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং মুসলিম-পরিচিতি তথা ইসলামের দোহাই তুলে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন। (হক, ২০১২, পৃ. ৩৫২)।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের গতি ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা পূর্বের তুলনায় অনেক কমে যায়। প্রতি বছর ১১ই মার্চ ভাষা দিবস পালিত হলেও পূর্বের মতো উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি। ১৯৪৯ সালে আরবি হরফে বাংলা লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে পূর্ব-বাংলার বুদ্ধিজীবী ও সচেতন মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।[২] সময়টা ১৯৫২ সাল। এর মধ্যে অনেক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হলো পূর্ব-বাংলার, যা জনমনে জন্ম দিয়েছে অসন্তোষ আর ক্ষোভ। এ ক্ষোভের আগুনে স্ফুলিঙ্গ হয়ে আসলো ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্য। জিন্নাহর মতো তিনিও রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে ঘোষণা দিলে পুনরায় তীব্র আন্দোলন শুরু হয়, গঠিত হয় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব-বাংলায় হরতাল ও জনসভার ডাক দেওয়া হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ১ মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে।

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল গণপরিষদ ভবনের দিকে এগোতে চাইলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি করে। গুলিতে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত, গফরগাঁওয়ের যুবক আব্দুল জব্বারসহ অন্তত ৬ জন (রফিক, ২০০৯, পৃ. ৫১)। একুশে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রাম থেকে শহর সবখানে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ রাজপথে নেমে আসে, সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে বাধ্য হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাদের গুলিতে নিহত হন হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান, রিকশাচালক আব্দুল আউয়াল, কিশোর অলিউল্লাহ, তাঁতিবাজারের যুবক সিরাজ উদ্দিন এবং নাম না জানা আরও কয়েকজন, যাদের সামরিক যানে ও পুলিশভ্যানে তুলে নিতে দেখা গেছে।[৩] অবশেষে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষাকে পূর্ব-বাংলার মাতৃভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়।

ভাষা আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে আত্মমর্যাদার লড়াই এবং সাংস্কৃতিক কারণকে গণ্য করা যায়। রবার্ট টেড গার *Why Men Rebel* গ্রন্থে বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যায় সাংস্কৃতিক কারণের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষ সহ্য করতে পারে না, এর সাথে চৈতন্য ও মানসিক অনুভূতির সম্পৃক্ততা অনেক নিবিড়। ঔপনিবেশিক দাসত্বের মনোভঙ্গি তৈরির জন্য যত উপাদান ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও কার্যকর অস্ত্র হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আর পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নব্য-স্বাধীন রাষ্ট্রে সুপরিকল্পিতভাবে এ অস্ত্রের ব্যবহার করেছিল পূর্ব-বাংলার গৌরবোজ্জ্বল সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, যা পূর্ব-বাংলার মানুষ কোনোভাবে মেনে নেয়নি।

কিন্তু ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল সীমিত এলাকায়, ছাত্র-শিক্ষকের একাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫২ সালে কৃষক-শ্রমিক, পেশাজীবী ও মধ্যবিত্ত এর সাথে যুক্ত হয়ে একে গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, তখনো পর্যন্ত পূর্ব-বাংলায় শিক্ষার হার ২১.১%, অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিকের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। আর স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পর্কে অনেকটা অসচেতন। তাহলে কেন তারা এ আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হলো? কারাই বা তাদের মধ্যে এ সচেতনতা তৈরি করল? আর মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন কি শুধু রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা করে আত্মমর্যাদা ও অতীত

গৌরব ধরে রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমস্যা, দাবি-দাওয়া, কাল্পনিক মুসলিম রাষ্ট্র ও বাস্তবিক পাকিস্তানের মধ্যে তুলনা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য এবং সর্বোপরি পূর্ব-বাংলার জনগণের সাথে মুসলিম লীগ সরকারের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের মধ্যে এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে এর প্রভাব পড়ে, পূর্ব-বাংলায়ও এর ভয়াবহতা দেখা যায়। বার্মা সীমান্তে জাপানি সৈন্যরা চলে আসলে পূর্ব-বাংলায়, বিশেষ করে চট্টগ্রামে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়, ভেঙে পড়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক নিরাপত্তা। বিদেশি সৈনিকদের অনৈতিক আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধদশা, খাদ্য-সংকট ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চড়া দামের পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় সর্বক্ষেত্রে নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি। 'বোট ডিনায়াল পলিসি' এবং সরকারের যথাযথ নজরদারি ও পদক্ষেপের অভাব এ পরিস্থিতিকে আরো সংকটাপন্ন করে তোলে (করিম, ২০০৮, পৃ. ৭৫-১২৬)। অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে শুরু হয় ১৯৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে ১৫-২০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় (Khosla, 2012, Pp. 33-34)। বিশ্বযুদ্ধ শেষে শুরু হয় আরেক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির চরম বলি হয় সাধারণ মানুষ, শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গায় (Great Calcutta Killing) উভয়পক্ষের কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয় (চ্যাটার্জী, ২০০৩, পৃ. ২৭০)। সামগ্রিকভাবে একটি বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটো রাষ্ট্র। ফলে পূর্ব-বাংলাকে কিছুদিনের মধ্যে ছাত্র-আন্দোলন ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট, খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, মূল্যস্ফীতি, আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতি, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা, গ্রেফতার, নিষেধাজ্ঞা, দমন-নিপীড়নসহ বহুবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয় (উমর, ১৯৭০, পৃ. ১৬০-৬৬)।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রত্যাশা, প্রাপ্তি এবং ভীতি

ভাষা আন্দোলনে যারা সক্রিয়ভাবে প্রথম থেকে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। দেশভাগের সময় পূর্ব-বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন এবং সরকারি চাকরি প্রায় সবখানে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রাধান্য ছিল। কারণ পূর্ব-বাংলায় মুসলিম সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির আবির্ভাব হয়েছিল হিন্দু সমাজের তুলনায় অনেক পরে, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। যুদ্ধজনিত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ, পাটের আন্তর্জাতিক বাজার এবং ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মুসলিম মধ্যবিত্তের উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিন্দু-মুসলমান পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার ফলে রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের সম্পৃক্ততা বাড়ে (সিংহ, ২০১২, পৃ. ১৮-১৯)। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হক জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হলে কৃষক পরিবার থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের পথ আরো প্রশস্ত হয় (খান, ২০১২, পৃ. ২৪)। এই উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বপ্ন ছিল মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে চাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে তাদের জন্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র তৈরি হবে। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণির সাথে আর প্রতিযোগিতা করতে হবে না (Hossain, 2010, Pp. 53-55)। কিন্তু ফল হলো উল্টো। দেশ-বিভাগ কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বাংলায় রাজনৈতিকভাবে তো বটেই, চাকরির ক্ষেত্রেও ঐ জায়গার বড়ো অংশ দখল করে নিলো আরেক অবাঙালি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি। দেশভাগের পরে পূর্ব-বাংলার সিভিল সার্ভিসে সমস্ত কর্মকর্তাই ছিল অবাঙালি। এর ফলে অবাঙালি অফিসাররাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতো (Umar, 2000, P. 23)।

এমন পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার সিদ্ধান্ত যে কতটা ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে, তা মধ্যবিত্ত সমাজ তথা ছাত্র-শিক্ষক ও আর্থিকভাবে কিছুটা সচ্ছল জনগোষ্ঠী বুঝতে পেরেছিল। বহুভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ভাষা যদি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে অন্য ভাষার মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে (রফিক, ২০০৯, পৃ. ১৬)। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে:

> বাঙালি মুসলমান যে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল সেটা কোনো আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় নয়, একেবারেই বৈষয়িক কারণে। মানুষ মুক্তি চাইছিল। দেশ স্বাধীন হলে মধ্যবিত্তের জন্য নতুন সুযোগ আসবে, হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীরা সামনে না থাকায় ক্ষেত্রটি হবে অবাধ, কৃষক অব্যাহতি পাবে জমিদারি ও মহাজনি ব্যবস্থার জোয়াল থেকে – এই আশাই ছিল আসল অনুপ্রেরণা। এখন দেখা গেলো ওই মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। বরঞ্চ গোলামির একটি চিরস্থায়ী জালে বাঙালিকে আবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। উর্দু তো কেবল রাষ্ট্রভাষা হবে না, উর্দু না জানার কারণে ওই ভাষায় দক্ষতার মানদণ্ডের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে বাঙালি নতুন করে পরাধীন হয়ে যাবে। স্বাধীনতা তার জন্য নিয়ে আসবে নতুন অধীনতা। ওই বোধ থেকেই মধ্যবিত্ত বাঙালি আন্দোলনে গেলো (ইসলাম, ২০০০, পৃ. ২৪৫)।

আবুল মনসুর আহমদ 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' প্রবন্ধে বলেন:

> উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি অশিক্ষিত ও সরকারি চাকরির অযোগ্য বনিয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফার্সির জায়গায় ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি অশিক্ষিত ও সরকারি কাজের অযোগ্য করিয়াছিল (হক, ২০০০, পৃ. ১৩৫)।

ফলে পূর্ব-বাংলায় নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিভিন্ন প্রগতিশীল ও উদার গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও ইংরেজিকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে জোর দাবি তোলে। এর প্রধান কারণ, মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি ছাড়া তাদের পক্ষে একদিকে যেমন চাকরি পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে (ঘোষ, ২০১৯, পৃ. ১০৯)।

এ গেল মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বপ্নভঙ্গের এক দিক, যেটি শিক্ষিত সমাজের ক্ষোভের কারণকে প্রতিফলিত করে। যাদের হাতে সামান্য পুঁজি আছে এবং শিল্প-কারখানা বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চায়, তাদেরও নানান ক্ষেত্রে পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে হওয়ায় লাইসেন্সসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। স্বাভাবিকভাবেই যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগ করতে চাচ্ছিল, তাদের অনেকের পক্ষে এ খরচ বহন করে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক-নীতির ক্ষেত্রে পূর্ব-বাংলার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করার ফলে পূর্ব-বাংলার উচ্চবিত্ত এবং শিল্পপতিরাও অনেকদিন থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয় (মুহিত, ২০০০, পৃ. ৯৮-১২৫)। ব্যবসা ও শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার জন্য সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে যেভাবে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল সেভাবে পূর্ব-বাংলায় করেনি। গোটা পাকিস্তানে ১৩৫টি শিল্প-উন্নয়ন কর্পোরেশনের মধ্যে ১৩২টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, যা শতকরা হিসাবে ৯৭.৭৮ শতাংশ। কৃষি ও ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের মোট ৪৮টির মধ্যে ৩৮টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, যা শতকরা হিসাবে ৭৯.১৭ শতাংশ। প্রতি বছর পূর্ব-বাংলা থেকে

আদায়কৃত ৬০-৭০ কোটি রুপি রাজস্ব করের সিংহভাগই ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে (Choudhury, 1984, Pp. 136-139)। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের মোট ১৭টি বস্ত্রশিল্পের মধ্যে পূর্ব-বাংলায় ছিল মাত্র ৩টি। অন্যান্য বৃহৎ ৩৭টি কারখানার মধ্যে পূর্ব-বাংলায় ছিল মাত্র ২টি। বাণিজ্যের ৯৯.৬ ভাগই ছিল করাচিতে আর মাত্র ০.৪ ভাগ ছিল চট্টগ্রামে (রহমান, ২০১২, পৃ. ৩৫)। পাট উৎপাদনে পূর্ব-বাংলার সুখ্যাতি থাকলেও অধিকাংশ পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, এ যেন আরেক ব্রিটিশ উপনিবেশের অভিজ্ঞতা, যেখানে ভারতবর্ষ কাঁচামালের জোগান দিত, আর ইউরোপে সব ভারি ও বৃহৎ শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি-আয়ের সিংহভাগই ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব-বাংলার সাথে এ বৈষম্যমূলক আচরণ তৎকালীন পার্লামেন্টে বাজেট-বিতর্ক প্রসঙ্গে পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত প্রতিবেদন:

> ...জনাব নূরুল আমীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। প্রথমতঃ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১৩৮ ধারার বিধান অনুসারে আয়করের যে অংশ পূর্ব-বাংলার প্রাপ্য, তাহা ইহাকে দেওয়া হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ উক্ত আইনের বিধান অনুসারে পাটশুল্কের শতকরা ৬২ ভাগ, যাহা এই প্রদেশকে দিবার কথা আছে, প্রাদেশিক সরকারের সহিত বিনা পরামর্শে একতরফাভাবে কেন্দ্রীয় সরকার নিজ তহবিলের যুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তৃতীয়তঃ আরও কতগুলো কর আদায়ের ব্যবস্থা যাহা এতদিন প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছিল, তাহাও কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের সম্মতি ব্যতিরেকেই অথবা অন্য উপায়ে হস্তগত করিয়াছেন (২৩ মার্চ, ১৬ বৈশাখ ১৩৫৮)।

ফলে যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী একটি গণতান্ত্রিক পূর্ব-বাংলার স্বপ্নে আপ্রাণ লড়াই করছিল, তারা দেখেছে পাকিস্তান একটি স্বৈরতান্ত্রিক সরকারে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই যে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ফারাক, তা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে:

> … For those who believed in democracy and supported the creation of Pakistan with the hope of establishing a democratic country, the early of Pakistan was the history of frustration. For those who came to power as Pakistan came into being as a separate entity, it was a period of desperation to stay in power. Hopes were dashed for the emerging middle class of East Pakistan who fought against the British power and Hindu zaminders with the hopes and aspirations that the newly form of Pakistan would be a place where they could live their lives in peace and tranquility with democratic rights and privileges the early political actions of the ruling leaders were totally disappointing. The West Pakistani leaders attempted to transform the tradition into an Imperial regime whose metropolis was Punjab and whose 'jewel in the crown' was Bengal. (Hossain, 2010, Pp. 67)

অন্যদিকে, সমাজের উচ্চবিত্তদের অনেকেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে উর্দুকে সমর্থন দিয়েছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব যাদের হাতে এসেছিল, তারা ছিল প্রধানত উর্দুভাষী, বিশেষ করে ঢাকার নবাব পরিবার। ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা নাজিমুদ্দিন এবং খাজা শাহাবুদ্দিন পাকিস্তানের মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মূলত পূর্ব-বঙ্গের মুসলিম লীগ তাঁদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হতো (রহিম, ২০২২, পৃ. ৫৬)। স্বভাবতই উর্দুর প্রতি তাঁদের বিশেষ আকর্ষণ

ও আগ্রহ ছিল। ফলে তাঁরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান (ঘোষ, ২০১৯, পৃ. ১১১)। তাছাড়া জমিদারি প্রথায় তাঁরা ছিল সবচেয়ে সুবিধাভোগী। ইতিহাসের চিরাচরিত নিয়মে সুবিধাভোগীরা খুব সহজে সংস্কার মেনে নিতে পছন্দ করে না। ফলে তারা পূর্ব-বাংলার মানুষের বিরাগভাজন হন।

কৃষক-শ্রমিকের অসন্তোষ, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং বিদ্রোহ

দেশভাগের পরে পূর্ব-বাংলায় শহরে বাস করে এমন মানুষের সংখ্যা ৫ শতাংশেরও কম; এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৮২.৩৪ শতাংশ কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিল (রহিম, ২০২২)। ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই পূর্ব-বাংলার রায়তদের ভাগ্যে লেখা ছিল নানারকম অমানবিক নির্যাতন, বঞ্চনা, শোষণ ও অবিচার। ১৯৩৫ সালে কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতাহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, মহাজনি সুদের কারবার নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণসালিশি বোর্ডের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণমুক্ত করা। কৃষক-শ্রেণি এ. কে. ফজলুল হকের প্রতি আস্থা রেখে মুসলিম লীগের পরিবর্তে কৃষক প্রজা পার্টিকে ভোট দেয়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কৃষকদের যথাযথ মূল্যায়ন ফজলুল হক মন্ত্রিসভা করেনি (সিংহ, ২০১২, পৃ. ২২)।

দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের জমিদারিগুলোতে হিন্দু জমিদারদের স্থান করে নিলো আর্থিকভাবে সচ্ছল মুসলিম উচ্চবিত্তরা, বিশেষ করে নবাব-শ্রেণি। ১৯৪৭ সালের পূর্বে কৃষকের শোষণ-নির্যাতন ও শ্রেণিদ্বন্দ্বকে সাম্প্রদায়িক আবরণে ঢেকে রাখার প্রয়াস ছিল বরাবরের মতোই। কিন্তু দেশভাগের পরে এ মিথ্যে ঠুনকো অজুহাতের আড়ালে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে কৃষকদের বেগ পেতে হয়নি। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর যথার্থই বলেছেন:

> In East Bengal, Caste Hindus dominated the society economically, politically and culturally. With the partition of Bengal, the dominance of the upper caste and upper class Hindus ended almost overnight … Consequent upon this, the Muslim peasants, both poor peasants and sharecroppers, and the rural wage-workers found themselves in the same economic relations with the landlord and the usurer, but with this difference that now they were no longer Hindus, but people belonging to their own religious 'brotherhood'. This change happened not only in the rural areas and in the agricultural sector, but in all spheres of life and in all sectors of production and distribution, in industry and business, and in the various professions. The Muslim peasants, workers, artisans and other working people found themselves in the same relations with the propertied classes, but such relations no longer had any communal dimensions. The exploiters and the exploited now confronted each other in the rural areas nakedly and without any illusion. (Umar, 2000, Pp. 26-27)

রায়ত-শ্রেণি আশা করেছিল স্বপ্নের পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি ব্যবস্থা বাতিল হবে এবং 'লাঙ্গল যার, জমি তার' ভিত্তিতে জমির মালিকানা পুনর্বিন্যাস করা হবে। মূলত তারা মুক্তি চেয়েছিল। এ মুক্তি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক বা চৈতন্যকেন্দ্রিক নয়, অর্থনৈতিক মুক্তি। যে মুক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে শোষণমুক্ত একটি সমাজ। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তা হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ হলো ১৯৫০ সালে। কিন্তু কৃষক দেখল তার ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন

হয়েছে এটুকু– জমিদারের জায়গায় এসেছে সরকারের আমলা, আর ক্রমাগত বর্ধিত হারে লক্ষ লক্ষ কৃষক হারিয়েছে তার চাষের জমি (ইসলাম, ২০০০, পৃ. ২৪৩-২৪৫)।

সাথে যুক্ত হয়েছে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ। ১৯৪৮-৫১ সালে সারা পূর্ব-বাংলা ছিল দুর্ভিক্ষকবলিত, কোনো কোনো অঞ্চলে তা মন্বন্তরের আকার ধারণ করে। চালের দামসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ছিল কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতার অনেক ঊর্ধ্বে। সরকার কার্যত কৃষকদের এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পূর্ব-বাংলায় ভয়াবহ কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রকোপে ব্যাপক মৃত্যুর পরেও পাকিস্তান সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। পূর্ব-বাংলার কৃষকদের নিরাপদ খাবার পানি ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল।[৪] ফলে বিক্ষুব্ধ জনতার স্লোগান হয়ে ওঠে: 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়– লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'।

অন্যদিকে দেখা যায় অধিকাংশ বৃহৎ শিল্প-কারখানা ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে। পাকিস্তানের বৈদেশিক অর্থনীতির ভিত্তি ছিল পাট, চা ও চামড়াশিল্প, যার উৎপাদনক্ষেত্র ছিল পূর্ব-বাংলা। কিন্তু এর সুফল পূর্ব-বাংলার শিল্প-মালিক বা শ্রমিক কেউ ভোগ করতে পারেনি। ফলে, তাদের অবস্থার উন্নতিও হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের চাহিদা কমে গেলে পাট-শ্রমিক ও কৃষক উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর্থিক সংকটে জরাজীর্ণ এই শ্রেণি শিক্ষা-দীক্ষা ও সচেতনতায় অনেক পিছিয়ে ছিল। কৃষক-শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং ভাষা আন্দোলনে তাদের শামিল করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভূমিকা পালন করেছিল ধর্মীয় এবং বিপ্লবী সাম্যবাদী ঘরানার সংগঠনগুলো (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ২৫৬-২৬৪)। সামগ্রিক এ অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বিচ্ছিন্নভাবে গোটা পূর্ব-বাংলায় দেখা যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে, বিশেষ করে ১৯৪৮ সাল থেকে সিলেট, খুলনা, যশোর, রাজশাহী, ময়মনসিংহসহ গোটা পূর্ব-বাংলায় কৃষকরা সংগঠিতভাবে শোষক ও শাসকদের বিরুদ্ধে অনেক ছোটো ছোটো বিদ্রোহ করে। এ সংগ্রাম ও বিদ্রোহের স্মারক ছিল ১৯৫০ সালে হাজং বিদ্রোহ, ১৯৪৯ সালে সিলেটের কৃষক আন্দোলন, ১৯৫০ সালে নাচোলে কৃষক বিদ্রোহ এবং ঢাকা-রাজশাহীসহ বিভিন্ন কারাগারে আটক রাজনৈতিক বন্দিদের আমরণ অনশন (উমর, ১৯৭০, পৃ. ৩২৭-৩৪৪)। কাজেই বলা যায়, কৃষক-শ্রমিকের দৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন শুধু সাংস্কৃতিক আন্দোলন নয়, অর্থনৈতিক শোষণ-মুক্তির আন্দোলনও।

ভাষা আন্দোলন এবং অসাম্প্রদায়িকতা

ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। ক্রমশ এর গভীরতা ও বিস্তৃতি বেড়েছে। এর পেছনে একদিকে যেমন রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ, অন্যদিকে রয়েছে ঔপনিবেশিক সরকারের 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সাম্প্রদায়িক সংকটকে আরো ত্বরান্বিত করে। ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে সরকার প্রবর্তন করেছিল হিন্দু-মুসলিম পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯০৯ ও ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন, খিলাফত আন্দোলন, রাজনীতিতে জিন্নাহর ব্যাপক উত্থান, ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, ১৯৩৫ সালের সংস্কার আইনে হিন্দু-মুসলিম পৃথক নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা ও রাজনীতি ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আলাদা একাধিক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং এ নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে সংখ্যালঘুরা ন্যায্য অধিকার ভোগ করবে এবং কোনো ধরনের শোষণের শিকার হবে না। উল্লেখ্য, দেশভাগ-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পূর্ব-বাংলায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অব্যাহতভাবে কমেছে। ক্রমান্বয়ে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাসের পেছনে রয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ-বিভাগকালীন অভিজ্ঞতা।

সাল	মুসলিম	হিন্দু	অন্যান্য
১৯১১	৬১.৬৭	৩১.২৯	৭.০৪
১৯২১	৬৪.৪৯	৩১.৪৮	৪.০৩
১৯৩১	৬৮.৩৮	২৮.৮৬	২.৭৬
১৯৪১	৭০.০৪	২৮.০০	১.৩৬
১৯৫১	৭৬.৮৫	২২.০৪	১.১১

তালিকা: পূর্ব-বাংলায় ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাত (রহিম, ২০২২, পৃ. ৫২)

কিন্তু বাস্তবিক অর্থে লাহোর প্রস্তাবে উত্থাপিত মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একাধিক না। তাছাড়া সংখ্যালঘুদের প্রতি যে আশ্বাস লাহোর প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছিল, তা বাস্তবায়নে পাকিস্তান সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। ফলে ১৯৫০ সালে আরেক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিজ্ঞতা হয়। এ দাঙ্গায় ৫-৭ হাজার মানুষ নিহত হয় এবং অন্তত ৩৫ লাখ মানুষ ভিটেমাটি হারিয়ে সীমান্ত অঞ্চল, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয় (ঘোষ, ২০১৬, পৃ. ৩৯৪-৪০০)। অল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের একসাথে আন্দোলন করার স্পৃহা জাগ্রত হতে আমরা দেখি। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি ও একাত্মবোধ কাজ করেছিল, যেন তার পুনর্যাত্রা শুরু হলো ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।

শ্রেণি-দ্বন্দ্ব থেকে অসাম্প্রদায়িক জাতীয় গণ-আন্দোলনে রূপান্তর

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একটি ব্যাপার একদম স্পষ্ট যে, সমাজের মধ্যবিত্ত, কৃষক-শ্রমিকসহ প্রায় সকলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ আর অসন্তোষ বিরাজ করছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষোভ সরাসরি অবাঙালি উচ্চবিত্তদের বিরুদ্ধে, যারা হয় এখানকার শিল্প-কারখানার মালিক অথবা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তারা মূলত এ জায়গাগুলোতে আসতে চায়। আর কৃষকদের ক্ষোভ ছিল জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে, এরা আবার অধিকাংশই নবাব পরিবারের। অর্থাৎ এদের দ্বন্দ্ব ছিল বাঙালি মুসলিম উচ্চবিত্তের সাথে। আবার অন্যদিকে রয়েছে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এ আন্দোলন কোনো শ্রেণির বিরুদ্ধে না হয়ে সরাসরি পূর্ব-বাংলার জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হলো? কীভাবে এ আন্দোলন একটি অসাম্প্রদায়িক গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো?

শ্রেণি-দ্বন্দ্বের নিরিখে যাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষটা ছিল তাদের অধিকাংশই কোনো না কোনোভাবে মুসলিম লীগ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে অথবা তারাই সরকারের সিদ্ধান্ত-প্রণেতা। যেমন খাজা নাজিমুদ্দিন নিজে জমিদার ছিলেন, তিনি আবার মুসলিম লীগ সরকারের একটি অংশও। আবার পূর্ব-বাংলায় আদমজি জুটমিলসহ যে ক'টা বৃহৎ শিল্প ছিল, একটারও মালিক বাঙালি ছিল না। এই নবাব ও উচ্চবিত্ত পরিবার

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সুরে তাল মিলিয়ে রাষ্ট্রভাষা উর্দুকে সমর্থন জানাচ্ছে। কাজেই উচ্চবিত্ত আর পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কণ্ঠ এবং স্বার্থ প্রায়ক্ষেত্রে একই সুর ও সুতোয় গাঁথা। আর তাছাড়া রাষ্ট্র বা সরকারের সদিচ্ছা না থাকলে কখনো শ্রেণির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দীর্ঘমেয়াদে সফল হওয়া যাবে না– এ সত্য দীর্ঘ আন্দোলন ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে কৃষক-মধ্যবিত্ত সবাই বুঝতে পেরেছিল। ফলে তাদের দেখানো কল্পিত মুসলিম রাষ্ট্রে সৃষ্ট প্রত্যাশা আর বাস্তবিক মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে প্রাপ্তির মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ তা মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে:

> The Muslim peasants, workers and the middle class people were taught to visualise Pakistan as a dreamland, where milk and honey would flow, everyone would get education and suitable job, healthcare would be there as a routine matter, and there would be a flowering of culture for which there was so much talk during the Pakistan movement. (Umar, 2000, P. 28)

সাথে যুক্ত হলো পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাব। পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক:

> The Government, rather than taking steps to correct the public grievances, seemed to be more interested and involved in summarily condemning all opposition as pro-India, pro-Communist and anti-Pakistan. This angered and alienated many patriotic people who were simply working toward better human conditions for themselves. It shows that the government officials, at both the Central and provincial levels, were not aware of the heavy price the country had already begun to pay in distrust and disharmony in East Pakistan. (Dil, Anwar & Dil, Afia, 2011, P. 200)

যারা এতদিন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ঢেলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরি করল, তাদের মুখে নতুন স্লোগান 'যারা আন্দোলন ও সমালোচনা করছে তারা দেশের শত্রু, ভারতের দালাল'– সমালোচনাকারী হিন্দু হোক, কিংবা মুসলিম। এমনও পোস্টার দেখা যায়, 'সতর্ক থাকুন পাশের জন সম্পর্কে, সে হতে পারে ভারতের চর'। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেশভাগের পরে প্রথম যখন ঢাকা সফরে বক্তব্য দিলেন (এই সফর জিন্নাহর শেষ ঢাকা সফরও বটে), তখন বারবার বুঝানোর চেষ্টা করেছেন, আন্দোলনকারীরা ভারতের প্ররোচনায় নিজেদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে এবং ভারতবর্ষকে পুনরায় একত্র করতে চাচ্ছে (উমর, ১৯৭০, পৃ. ১০৩-১১২)। যে পূর্ব-বাংলার মানুষ এতদিন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত ছিল এবং নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্নে বিভোর ছিল, তাদেরকে যখন শাসকগোষ্ঠী 'ভারতের দালাল' আখ্যা দেয় তখন আর বুঝতে দেরি থাকে না যে, স্বার্থ আদায়ের জন্য এটা আরেক ব্রিটিশ 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি, যেখানে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত জিইয়ে রাখতে চায়। গণমানুষের চৈতন্যে এ বোধ উদয়ের ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প হয়ে পড়ে অকার্যকর। হিন্দু-মুসলিম একসাথে হয়ে শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করে। মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব-বাংলায় সাম্প্রদায়িক সংকট থেকে উত্তরণ শুরু হয়। মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের জনগোষ্ঠীও। কারাবরণ করেছেন বসন্ত কুমার দাস, সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত, মনোরঞ্জন ধর,

কামিনী কুমার দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধ চন্দ্র দাসসহ অনেক হিন্দু নেতা (Dil & Dil, 2011, Pp. 199-200)।

১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিলে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অগ্রযাত্রা আরো বহুদূর এগিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলকে বলা যায় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের ফসল। সে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন লাভ করে এবং মুসলিম লীগ মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে লাভ করে মাত্র ১০টি আসন [৫] (Dil & Dil, 2011, Pp. 199-200)। যুক্তফ্রন্টে উদারপন্থি আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে নেজামে ইসলামী ও খেলাফতে রব্বানীর মতো ডানপন্থি দল এবং গণতন্ত্রী পার্টির মতো বামপন্থি দলের সমন্বয়ে সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারনীতির রাজনীতি শুরু হয়। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে গণমানুষের জন্য রাজনীতির সফলতার বড়ো নিদর্শন বলা যায় এ নির্বাচন। এ নির্বাচনের ফলাফল যদি হয় একুশে ফেব্রুয়ারির গণ-মানুষের রায়, তাহলে এটাও সত্যি যে, একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন কিংবা যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন দুটোতেই জয় হয়েছে অসাম্প্রদায়িক বাঙালির। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাংলার মাটিতে কোনো সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল সংখ্যারিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে তমদ্দুন মজলিস, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, যুবলীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ, ইসলামি ভ্রাতৃসংঘ প্রভৃতি সংগঠনের ব্যানারে ছাত্র-জনতা সবাই একসাথে ভাষার দাবিতে আপসহীন আন্দোলন করতে থাকে। যেখানে মেলবন্ধন ঘটেছে নানা মত, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের। কৃষক-শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি অখণ্ড ভারত কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা চায়নি, প্রকৃতপক্ষে তারা চেয়েছে শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রে তারা শীঘ্রই আবিষ্কার করল তার সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে আরেক অবাঙালি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকরি, আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী সবকিছু তাদের দখলে। নতুন করে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপক্ষ শুরু করতে চেয়েছিল আরেক ঔপনিবেশিক শোষণ, যার প্রথম পদক্ষেপ ছিল রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে শাসকগোষ্ঠী বাঙালিকে বুঝিয়ে দিলো যে এখানে গণতন্ত্র থাকবে না, থাকবে স্বৈরাচার। ফলে শুরু হলো পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম গণআন্দোলন এবং সে আন্দোলনে শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ ব্যবধানের ঊর্ধ্বে উঠে বাঙালি হয়ে উঠলো এক ও অভিন্ন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানের মধ্যে নিহিত ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি। লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনকারী এ. কে. ফজলুল হক, মুসলিম লীগের আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাসেমের মতো জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ভাষা আন্দোলন ও পূর্ব-বাংলার দাবি-দাওয়ার প্রতি একাত্মতা পোষণ করে কেউ কেউ কারাবন্দিও হন। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের যে জাতীয় ঐক্য তৈরি হয়েছিল তার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে। ভাষা আন্দোলন প্রতিটি সংগ্রামে জুগিয়েছে শক্তি, সাহস এবং অনুপ্রেরণা।

টীকা

১. ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলার ২৫০ আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৩টি, কংগ্রেস ৮৬টি এবং অন্যরা ৫১টি আসন লাভ করে।

২. আরবিতে বাংলা লেখার তথা মুসলমানি বাংলার কিছু নমুনা হলো: 'পিছলে এতোয়ার খান গাফফার খাঁর লড়কা গ্রেফতার হয়েছে। '...হুকুমতে হায়দারাবাদ হুকুমত হিন্দুস্থানের খেলাফে জং ও জেহাদের ইরাদা জাহির করেছেন।' গুপ্ত, সন্তোষ (২০১৯), 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ', মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা. ২৫০।

৩. এলিস কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় যুক্তিসঙ্গত কারণেই পুলিশ ২৭ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এর পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। এই কমিশনের প্রতিবেদন পক্ষপাতদুষ্ট এবং সরকারকে অপরাধমুক্ত করার একটা প্রয়াস ছিল। আহমদ, রফিক (২০০৯), *ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, পৃষ্ঠা ৫৮।

৪. পূর্ব-বাংলার স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা কেমন ছিল তা বোঝা যায় ১৯৪৯ সালে ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে। দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, ২৪শে জানুয়ারি ১৯৪৯, ১৭ই মাঘ ১৩৫৫, পৃষ্ঠা ২।

৫. "The Muslim League that had led the people of Muslim Bengal to Pakistan was dead and buried in East Pakistan". Quoted in Dil (2011), P. 200.

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান। (২০১২)। *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*। ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন।

ইসলাম, সিরাজুল। (২০০০)। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন'। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং অন্যান্য (সম্পা.), *অমর একুশে প্রবন্ধ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

উমর, বদরুদ্দীন। (১৯৭০)। *পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, (প্রথম খণ্ড)। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

উমর, বদরুদ্দীন। (১৯৯৫)। '২/২/১৯৫২ এবং ১১/২/১৯৫২ তারিখে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশিত ইশতেহার'। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

করিম, আবদুল। (২০০৮)। *সমাজ ও জীবন* (প্রথম খণ্ড)। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

খান, শামসুজ্জামান। (২০১২)। 'স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভবের পটভূমি'। অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় পর্ব)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। (২০১৯)। 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও উত্তরকাল'। মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

ঘোষ, সুশান্ত। (২০১৬)। '১৯৫০-এর দাঙ্গা ও তার প্রভাব'। বুদ্ধদেব ঘোষ, এবং দেবব্রত বিশ্বাস (সম্পা.), *সাতচল্লিশের দেশভাগ*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

চক্রবর্তী, অমিতাভ। (২০১৪)। *বাংলার কৃষক: কালে কালোত্তরে*। কলকাতা: উবুদশ।

চৌধুরী, আবদুল মমিন। (২০০২)। *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

চ্যাটার্জী, জয়া (২০০৩)। *বাংলা ভাগ হল*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

পাকিস্তানের শিল্প-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানির তথ্য, কৃষি ও বিভিন্ন খাত থেকে আয়-ব্যয়, আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে জানতে দেখুন- মুহিত, আবুল মাল আবদুল। (২০০০)। *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

'পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা'। সাপ্তাহিক *বেগম*, ৩রা আগস্ট, ১৯৪৭।

মৈত্র, রণেশ। (২০১৯)। 'একুশ মানে যৌবন-জোয়ার'। মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

রফিক, আহমদ। (২০০৯)। *ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

রহমান, আতিউর। (২০১২)। 'মুক্তিযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক পটভূমি'। অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা.)। *বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় পর্ব)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রহমান, মুহম্মদ মতিউর। (১৯৯২)। *বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: চন্দ্রদ্বীপ প্রকাশন (তিনি ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন)।

রহিম, মো. আবদুর। (২০২২)। *পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ*। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

সিংহ, কঙ্কর। (২০১২)। *১৯৪৭'র বাংলাবিভাগ অনিবার্য ছিল*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

হক, মফিদুল। (২০১২)। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং শিল্পী-সংস্কৃতিসমাজের ভূমিকা'। অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা.)। *বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় পর্ব)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হোসেন, আবু মো. দেলোয়ার। (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হক, আবদুল। (২০০০)। 'ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি'। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং অন্যান্য (সম্পা.), *অমর একুশে প্রবন্ধ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

দৈনিক আজাদ পত্রিকা, ২৩শে মার্চ, ১৬ই বৈশাখ ১৩৫৮।

Choudhury, A. K. (1984). *The Independence of East Bengal*. Bangladesh: Jatiya Grantha Kendra.

Dil, Anwar & Dil, Afia. (2011). *Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh*. Intercultural Forum. Dhaka: California & Adorn Books.

Hossain, Mokerrom. (2010). *From Protest to Freedom; The Birth of Bangladesh*. Dhaka: Shahitya Prakash.

Khosla, G.D. (2012). 'The Partition of the Ways'. Kaushik Roy(ed.), *Partition of India; Why 1947?*. New Delhi: Oxford University Press.

Umar, Badruddin. (2000). *Language Movement in East Bengal*. Dhaka: Jatiya Grontho Prakashan.